অনুষ্টুপ
বর্ষা ২০২৪

দলিত বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা

দলিত ভারত

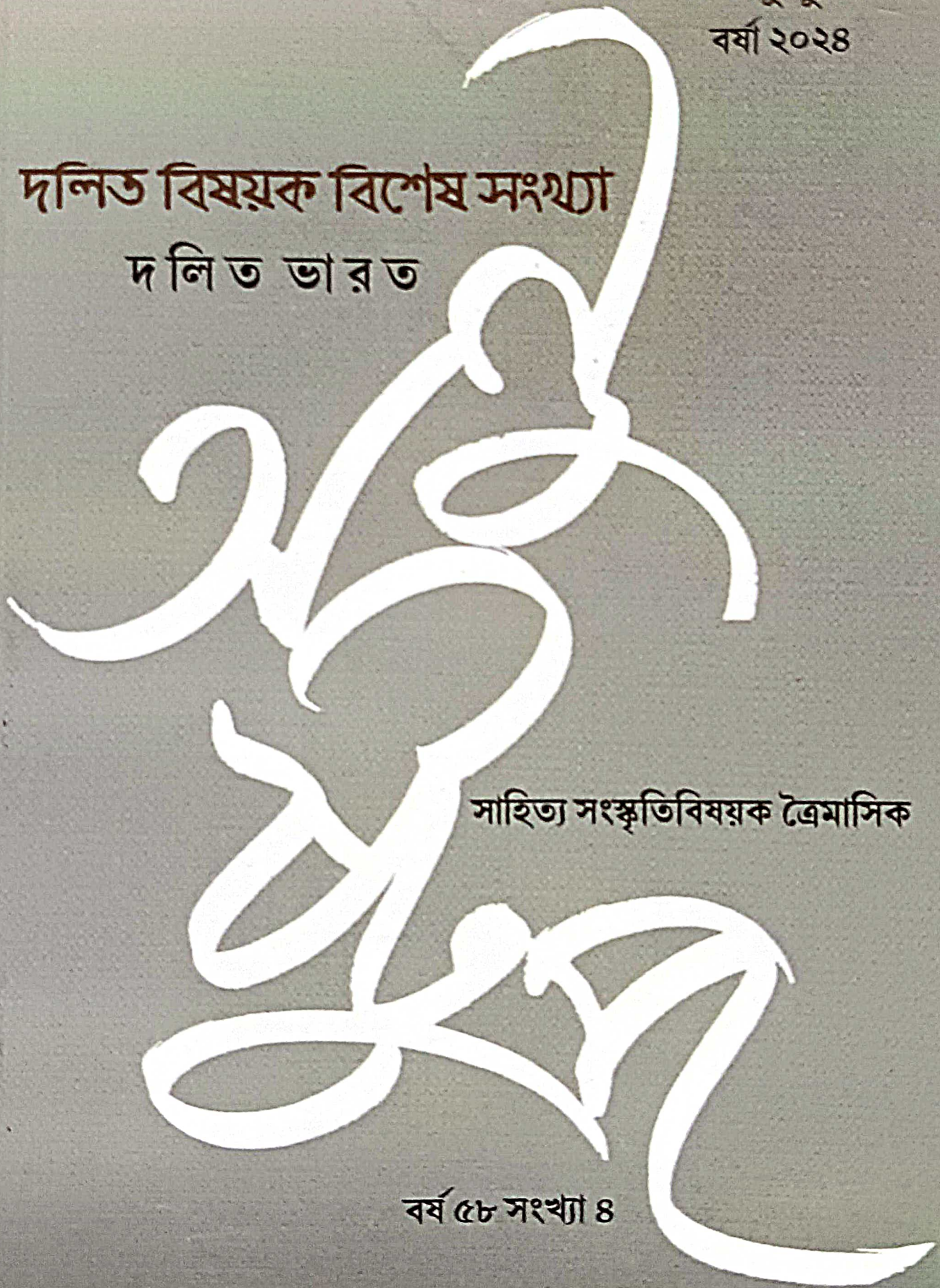

সাহিত্য সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৪

অ নু ষ্টু প

দলিত বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা

দ লি ত ভা র ত

৫৮ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, প্রাক্-শারদীয় ২০২৪

পত্রিকার কথা

সম্পাদকীয়

অতিথি সম্পাদকদের কথা

পর্ব - ১

দলিত ভারত

সাম্প্রতিক দলিত আন্দোলনের নানা ধারা/দেবী চ্যাটার্জী ৩

আমার জীবন ও দলিত তত্ত্ব/গোপাল গুরু ১৮

'জাতিভেদ প্রথা ভেঙে ফেলা অসম্ভব নয়': আনন্দ তেলতুম্বড়ে/
সাক্ষাৎকার: স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য ২৫

নিয়োলিবারাল যুগে দলিতের উভয়সঙ্কট/বদ্রী নারায়ণ ৩১

দলিত সাহিত্য: ফিরে দেখা/শ্রীপাদ ভালচন্দ্র যোশী ৪৫

দলিত আত্মকথনে নবনির্মাণের রাজনীতি/রিয়া মুখার্জী ৫৩

পাঞ্জাবি দলিত সাহিত্যে অস্তিত্ব, সত্তা ও বিস্তার/পরমজিত এস জাজ ৮৭

ছন্দের অলিন্দে প্রতিরোধ: মহারাষ্ট্রের দলিত কবিতা/
স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় গুহ ১১০

দলিত নারীর আত্মকথায় বর্ণবিরোধী রাজনীতি/শিবানী কাপুর ১৫১

দলিত ভারত: একটি সংখ্যাগাণিতিক পরিচয়/কুমার রাণা ১৭২

পর্ব - ২

দলিত বাংলা

মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার দলিত সমাজ/কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ২২৭

রাজনীতির চক্রব্যূহে বিস্মৃত যোগেন্দ্রনাথ/বাপ্পাদিত্য রায় ২৪১

পঞ্চানন বর্মা এবং রাজবংশী রাজনীতি/বিমল চন্দ্র বর্মণ ২৬১

সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পৌণ্ড্র জাতি/প্রসেনজিৎ নস্কর ২৮২

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামসমাজ ও দিনমজুর বাগদি সম্প্রদায়/সুজিত মাঝি ৩০৯

কলিকাতার নগর-পরিসর ও ডোম সম্প্রদায়/কিংশুক ভট্টাচার্য্য ৩৪১
মফস্‌সল, মেথর, এবং মা কালী/শুভদীপ মণ্ডল ৩৭০
পশ্চিমবঙ্গীয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়/নির্মলেন্দু শাঁখারু ৩৮৫
পশ্চিমবঙ্গের বাউরি জাতি: একটি পরিচয়/উত্তম দাস ও সুজিত মাঝি ৪০০
চটকল মজদুর ও দলিত সংস্কৃতি/শত্রুঘ্ন কাহার ৪১৪
পশ্চিমবঙ্গে দলিত কর্মচারী আন্দোলন/নারায়ণ বিশ্বাস ৪৩২
কর্মক্ষেত্র ও দলিত নারী/বৈশালী বিশ্বাস ৪৪৫
বাংলায় দলিত সাহিত্য আন্দোলন/অনীক বিশ্বাস ৪৫৯
উচ্চ শিক্ষায় সংরক্ষণ: প্রবঞ্চনার কাহিনি/দেবেশ দাস ৪৭২

পর্ব - ৩
জাতের ঊর্ধ্বগতি

বাংলার মধ্যমবর্গ ও সদ্‌গোপ জাতি প্রসঙ্গ/অর্যমা ঘোষ ৪৮১
ঔপনিবেশিক বাংলায় মাহিষ্য গতিশীলতার সন্ধান/পার্থ মুখার্জ্জী ৫৫৩

পর্ব - ৪
আলোচনায় দলিত

সে পথে তুমি একা: আনন্দ তেলতুম্বডের অন্বেষণ/শুভময় ঘোষাল ৫৯৫
কেরলের জাতপাতের জটিল চালচিত্র/অচিন চক্রবর্তী ৬২৪
ভীত শিক্ষক, মেরুদণ্ডহীন শিক্ষার্থী ও মৃত নাগরিক/মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩০
প্রথম দলিত কমিউনিস্ট রামচন্দ্র বাবাজি মোরে/শাওন দাস ৬৩৮
হাতিদের মাঝে পিঁপড়ের দল/আবাহন দত্ত ৬৫৩
ভারতরাষ্ট্র ও ভীমা কোরেগাঁও/তাপস সিংহ ৬৬২
সূর্যের সঙ্গে বার্তালাপ/সাধন বিশ্বাস ৬৬৯
এক নিচু জাতের ডাক্তার ও সমাজকর্মীর কাহিনি/সুজিত মাঝি ৬৭২
স্রষ্টা যেখানে সৃষ্টি/কুমার রাণা ৬৭৬
মানুষের নিরবচ্ছিন্নতার উপকথা/কুমার রাণা ৬৮১

পর্ব - ৫
পুনরুদ্ধৃত রচনা

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতি-বর্ণের বিলুপ্তি/সন্তোষ রাণা ও ভাস্কর নন্দী ৬৮৯
যে সমাজের মাথা নীচে পা ওপরে/ভগবতী দেবী ৭০১

হীরা ডোম আমরা প্রত্যেকে/বিশ্বজিত সেন ৭০৬
দলিত সাহিত্য: স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সাহিত্যে অভিনব সংযোজন
/জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ৭১১

পর্ব - ৬

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের দলিত কবিতা

ভূমিকা: দেবকুমার সোম ৭৪১
বাংলা: শ্যামলকুমার প্রামাণিক/আমার বুকের কাছে আজন্মের যন্ত্রণা ৭৪৩; হৃষিকেশ হালদার/বল্লাল সেনের ঘোড়াগুলি ৭৪৪; কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল/বনচণ্ডালী ভইলি-১ ৭৪৪, বনচণ্ডালী ভইলি-২ ৭৪৬; বিষ্ণুপদ বালা/পরিচয় ৭৪৭। **মহারাষ্ট্র:** যশবন্ত মনোহর/গতকালের যে বর্ষা ৭৪৮; নামদেব ঢসাল/ওদের সনাতন অনুকম্পা ৭৪৯; আত্মারাম কণিরাম রাঠোড়/আর কত দিন ৭৫০; বামন নিম্বালকর/আমার মৃত্যু ৭৫১; মীনা গজভিয়ে/গভীর অন্ধকারের চেয়েও গভীরতর ৭৫৩; জ. বি. পাওয়ার /আমার পাঁজরগুলোই না হয় নাও ৭৫৪; ত্রম্বক সপকালে/আমি তবে কী করব ৭৫৫; অর্জুন ডাঙ্গলে/ওদের সূর্য এখন উদিত হচ্ছে ৭৫৭; কিসন ফাগুজি বন্‌সোড়/বিনা লড়াইয়ে মুক্তি নেই ৭৫৮; আন্নাভাউ সাঠে/আঘাতে আঘাতে পৃথিবী বদলে দাও ৭৫৯; রাম বসাক্ষেত্রে/প্রোমোশন ৭৬০; নরেশকুমার ইঙ্গলে/অনেক দেখলাম ৭৬০; ওয়াহারু সোনাওনে/স্টেজ ৭৬১; অরুণ কালে/পুরোনো বইয়ের নূতন পাঠ ৭৬১; রাম দোতণ্ডে/আমি ৭৬২; ভুজঙ্গ মেশ্রাম/জাঙ্গাড় ৭৬২; জাভেদ কুরেশী/মুরগির খাঁচা ৭৬৩।

অনুষ্টুপ/১৯৬৬-২০২৪

সম্পাদক
অনিল আচার্য

অতিথি সম্পাদক
কুমার রাণা
কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর

সহযোগী সম্পাদক
অচিরাংশু আচার্য

সম্পাদকীয় সহযোগী
সন্দীপন সেন

বিশেষ সম্পাদকীয় সহযোগী
দেবকুমার সোম

বিশেষ সহযোগী
অরুণ কর্মকার
সুমিত আচার্য

প্রচ্ছদ: রূপায়ণ পাল

অলংকরণ: কুমার রাণা

কার্যালয় সচিব: সুশান্ত ঘোষ

কর্মসচিব: অতীশ ঘোষ

বর্ণসংস্থাপনা: রাজু রায়

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ডি. অ্যান্ড পি. গ্রাফিক্স প্রা. লি.
১৪৩ ওল্ড যশোহর রোড, গঙ্গানগর
কলকাতা-১৩২

ISSN : 0974 2697

দাম : ৭৫০/ **সডাক ৮৫০/**

কার্যালয়
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
দূরভাষ: ০৩৩ ২২১৯-১৯৩৭
email: anustuppotrika@gmail.com

চটকল মজদুর ও দলিত সংস্কৃতি

শত্রুঘ্ন কাহার

বাংলায় প্রথম চটকলটি গড়ে উঠেছিল হুগলি জেলার রিষড়ায় ১৮৫৫ সালে। পরবর্তী দুই দশকে চটশিল্পের প্রসার ঘটে দ্রুত। ফলে ১৮৯০-এর দশক থেকেই দলে দলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ থেকে অভিবাসী শ্রমিকেরা বাংলায় ভিড় করতে থাকে।[1] অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে একটি বড় অংশই ছিল নিম্নবর্ণের মানুষ। বিহার, উত্তরপ্রদেশের এই ভূমিহীন মানুষরা বাংলার জুটমিলগুলিতে শ্রমিকরূপে নিযুক্ত হলেও, তাঁদের গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক আদবকায়দা ও জাতপাতের প্রশ্ন তাঁদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে ছিল, তবে তার উপর শহুরে প্রভাবও বেশ লক্ষ করা যায়।

বাংলায় হুগলি নদীর উভয় তীরে চটশিল্প প্রসারের প্রথম কুড়ি বছর স্থানীয় শ্রমিকরাই এই শিল্পের শ্রমের চাহিদা পূরণ করে। তবে কালক্রমে এই শিল্পে বাঙালি স্থানীয় শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। এর নানা কারণ, যেমন, বাংলায় কৃষিকাজ যথেষ্ট লাভজনক হওয়া, কলের কাজকে বাঙালি সামাজে নিচু নজরে দেখা ইত্যাদি। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে কলের কাজকে কী-রূপে দেখা হত তার কিছু প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ছোটগল্প 'মহেশ'-এ। উক্ত গল্পে গফুর যখন তার মেয়ে আমিনাকে গ্রাম ছেড়ে ফুলবেড়ের চটকলে যাওয়ার কথা বলে তখন তার মেয়ে অবাক হয়ে যায়। তার মনে পড়ে "ইতিপূর্বে অনেক দুখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজি হয় নাই; সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু থাকে না, একথা সে বহুবার শুনিয়াছে।"[2] চটশিল্পকে কেন্দ্র করে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ক্রমশ শহরের রূপ নিতে থাকে। এই শহরগুলিতে ধর্ম বা জাতের গুরুত্ব কত ছিল তা অনুধাবন করা যায় মহাশ্বেতা দেবীর 'হারুন সালেমের মাসি' গল্পে: হারুনের মাসি গৌরবি যখন

হারুনকে সঙ্গে নিয়ে শহরে চলে যাওয়ার কথা বলে, তখন হারুন জিজ্ঞেস করে, "শওরে যে তুমি যাও না, তুমি হাঁটতে পার না যে?" গৌরবি বলেন, "পারব হারা। শোন, আমরা শওরে যাব। সেখানে কেউ কারো কোনো কথা জানতে চায় না। কেউ কারে চিনে না।... ভিক্কে করব। কেউ তোর পরিচয় জানবে না, আমার পরিচয় জানবে না।" লেখিকার ভাষায় বলতে হয়, "শহরে গৌরবি আর হারার সমাজ অনেক বড়ো। সমুদ্রের মতো। সেখানে একবার মিশে যেতে পারলে আর কোনো ভয় থাকে না।"[3] সুতরাং এক কথায় বলা যায় শহরের জাত ধর্ম থাকে না। কিন্তু বাংলার চটকলের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি কতটা প্রযোজ্য ছিল তা অনুসন্ধানের বিষয়।

চটকল স্থাপনের প্রথম দিনগুলিতে খুব সহজেই শ্রমিক পাওয়া যেত। কৃষিকাজ থেকে তুলনায় আয় কম হওয়ায়, স্থানীয় ও নিকটবর্তী অঞ্চলের বাঙালি কৃষকরা বিশেষত, নিম্নবর্ণের বাউরি, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, প্রামানিক, গোয়ালা (ঘোষ), ইত্যাদি সম্প্রদায় ও মুসলমানরা মিলের কাজে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায় ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা চটকলের কাজে তেমন আগ্রহী হয়নি। কৃষিনির্ভর দরিদ্র এই মানুষেরা কিন্তু অচিরেই এক দিশাহারা অবস্থায় পতিত হয়। কৃষিকাজ এতদিন তাদের রোজগারের একমাত্র রাস্তা ছিল। চটকলের শ্রমিক হিসাবে তাদের রোজগার বাড়লেও এবং চটকলকেন্দ্রিক সমাজে একধরনের স্বাধীনতার স্বাদ পেলেও, তাদের আগের জীবন দারিদ্র ও অনটন ক্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, তাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক জীবন ও অভ্যাস ও তদ্‌জনিত পৃথক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কষ্টভোগ করতে থাকে। এই দিশাহারা অবস্থা খুব সুন্দর ভাবে বোঝা যায় ভোলা বৈরাগীর একটি লোকসঙ্গীত থেকে:

কলেতে নিলাম কাজ, ছেড়ে গেল বউভাজ
এবার ঠাঁই দে গো পাটেশ্বরী মা
গেছে লাঙল জোয়াল বলদ, মাগো ঘরভাঙ্গা না করলি রদ
গড় করি গো পাটেশ্বরী তোরে ছেড়ে যাব না।[4]

চটকলের ইংরেজ মালিকরা অল্পদিনের মধ্যেই শ্রমিকদের বিশ্বাস, অভ্যাস ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে, সেগুলিকে নিজেদের কাজে সঠিকভাবে লাগাতে উদ্যোগী হয়। এ সম্পর্কে একটি স্থানীয় কথা চালু ছিল যে, জুটমিলের হিসাব রক্ষক ও টাইম কিপার (টাইমবাবু) হিসাবে উচ্চবর্ণের লোকদের বিশেষত ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করা হত। যেহেতু নিম্নবর্গের লোকেরা বামুন ঠাকুরের কথা সাধারণত মেনে চলত, তাই ব্রাহ্মণদের টাইমবাবু হিসাবে নিয়োগ করার পিছনে

সাহেব মালিকদের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে শ্রমিকরা রোজ নিয়মিত সময়ে কাজ করতে আসে এবং যখন তখন কাজে অনুপস্থিত না হয়। যদি কোনো উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বলে যে, তোরা কোম্পানির টাকা খাচ্ছিস, দেরি করে কাজে এসে বা কাজ না করে ধর্ম খাসনে, এই শব্দগুলি শ্রমিকদের মধ্যে দুর্দান্ত প্রভাব ফেলত, কিন্তু নিম্নবর্ণের কোনো টাইম কিপার শ্রমিকদের কাছে একই বাক্য বললে তার কোনো প্রভাব থাকত না।[5]

কিন্তু কয়েক বছর ধরে স্থানীয় শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করার পর ইংরেজ মালিকরা এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যে, চটকলে স্থানীয় শ্রমিকরা কৃষিকাজের থেকে বেশি উপার্জন করতে পারে, শুধুমাত্র এই আকর্ষণই তাদের কারখানার কাজে ধরে রাখা বা পুরোপুরি চটকলের শিল্পশ্রমিকে পরিণত করতে পারবে না। সুযোগ পেলেই তারা চটকলের কাজ ফেলে রেখে গ্রামীণ উৎসব অনুষ্ঠানে মেতে উঠত। দারিদ্র সত্ত্বেও প্রাচীন রীতিনীতি, গ্রামীণ পরিবেশ ও ঐতিহ্যবাহী জীবনধারার প্রতি টান তাদের কখনোই চটকলের শ্রমিকজীবনে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। কাজেই চটকলের মালিকরা বুঝতে পারে যে, বেশি মজুরি দিয়েও তারা কখনোই স্থানীয় শ্রমিকদের কাছ থেকে সর্বাধিক উৎপাদনশীলতা আদায় করতে পারবে না। তাছাড়া, শ্রমিকদের মজুরি যতই কম দেওয়া যায়, ততই তাদের মুনাফা বাড়বে। এই পরিস্থিতি চটকল মালিকদের পরিযায়ী (migrant) শ্রমিকের দিকে নজর ফেরাতে বাধ্য করে। এই চিন্তাধারা থেকেই তারা তাদের মনোনিবেশ স্থানীয় শ্রমিক থেকে অভিবাসী শ্রমিকের দিকে নিয়ে যায়।[6]

এই অবস্থায় ১৮৯০-এর দশকের পর থেকে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশা থেকে দলে দলে মানুষ বাংলার চটকল অঞ্চলে ভিড় জমাতে শুরু করল (প্রসঙ্গত, বিহার ও ওড়িশা ১৯১২ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল) । ঊনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় চটকলের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, শ্রমিকের চাহিদাও ততই বাড়তে থাকে এবং স্থানীয় বিশেষত অদক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা ততই প্রকট হতে থাকে। তুলনামূলকভাবে বাংলায় কৃষিশ্রমিকের মজুরির হার বেশি থাকায় এবং কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত পাটকলগুলির সঙ্গে বাংলার বিশেষত পূর্ববাংলার জেলাগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল থাকার কারণে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলা থেকে চটকলে ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমিক আসার সম্ভাবনা ছিল না। অন্যদিকে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলগুলির সঙ্গে কলকাতার সড়ক ও রেল উভয়পথেই যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সুগম ছিল। তাছাড়া, এই সব অঞ্চলে গ্রামীণ বেকারত্ব ও আধা বেকারত্বের (underemployment) হার বেশি থাকার

জন্য কৃষিমজুরির হারও তুলনায় অনেক কম ছিল। কাজেই, তার ফলে বাংলার চটকলগুলিতে কাজ করার জন্য এই শ্রেণির মানুষদের আগ্রহ স্বভাবতই বেশি ছিল। আর একটি বিষয় হল বাংলাদেশে কায়িক ও কারখানার কাজকে, এমনকি কৃষিকাজের তুলনায়ও সমাজে হীন দৃষ্টিতে দেখা হত।[7]

১৯০৫ সালের মধ্যে দেখা যায় যে, মিল শ্রমিকের প্রায় ২/৩ অংশ বহিরাগত এবং স্থানীয় শ্রমিকদের চেয়ে তাদের উপস্থিতি লক্ষণীয় ভাবে প্রকট।[8] ১৯২৯ সালে রয়্যাল কমিশন অন লেবার লক্ষ করেছিল যে, বিশ শতকের শুরু থেকে কলকাতা শিল্পাঞ্চলে অ-স্থানীয় (non-local) শ্রমিকের বিপুল সংখ্যাধিক্যের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা কখনও পরিবর্তিত হয়নি এবং ১৯২০-এর দশকের মধ্যে এই অস্থানীয় চরিত্র একটা স্থানীয় রূপ নিয়েছিল।[9] পরবর্তীকালে, এমনকি স্বাধীনতা-উত্তরকালেও, শ্রমিক শ্রেণির এই চরিত্র বজায় ছিল।

পাটকল শ্রমিকদের এই বৃহদংশ অভিবাসী (immigrant) বা অ-স্থানীয় হবার ফলে এই শ্রমিক শ্রেণির চরিত্রের কতকগুলি দিক গোড়া থেকেই উল্লেখযোগ্য ছিল। ভারতের অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মতোই চটকল শ্রমিক চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তীকালে তাঁদের সামাজিক গঠন, আশাআকাঙ্ক্ষার বিস্তার ও সংগ্রামের চরিত্র বুঝতে গেলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং দূরাগত গ্রামীণ উৎস থেকে আসার ফলে দীর্ঘদিন তাঁদের অর্ধ-কৃষক অর্ধ-শ্রমিক চরিত্র বজায় ছিল। পরবর্তীকালে তাঁরা পুরোপুরি শিল্পশ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হলেও, তাঁদের চেতনা থেকে এই ঐতিহ্য কখনও মুছে যায়নি।[10]

প্রথমত, চটকলগুলি কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চলে কিছু ঘনসন্নিবিষ্ট অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল, অভিবাসী শ্রমিকরাও এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলেই বসবাস করত।

দ্বিতীয়ত, অবাঙালি শ্রমিকের সাধারণ আধিপত্য সত্ত্বেও, কিছু অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে বাঙালি শ্রমিকের প্রাধান্য বরাবর বজায় ছিল। হাওড়ার চেঙ্গাইল, বাগনান বা ২৪ পরগণার বজবজ অঞ্চলের বিভিন্ন চটকল, এর উদাহরণ।

তৃতীয়ত, ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, স্পিনার এবং উইভার-এর মতো দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালি শ্রমিকের সংখ্যা বেশি ছিল (৩১% মতো), যেখানে অদক্ষ শ্রমিকের মধ্যে তা ছিল মাত্র ১৮ শতাংশ মতো। অবশ্য, বাংলায় বসবাসকারী অবাঙালি শ্রমিকের যে সব সন্তান পরে মিলের কাজে যোগ দিয়েছিল জনগণনার নিয়ম অনুযায়ী, তাদেরও বাঙালি বলে অন্তর্ভুক্ত করায় বাঙালি শ্রমিকের শতকরা হার বেশ কিছুটা বেশি দেখিয়েছিল, যারা ছিল আদি অবাঙালি শ্রমিকের বাংলায় জাত পরবর্তী প্রজন্ম।

চতুর্থত, সম্প্রদায়গত (communal) হিসাব অনুযায়ী, ১৯২১ সালের জনগণনা অনুসারে উর্দুভাষী উত্তর-ভারতীয় (up country) মুসলমানের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমিকের ৩১ শতাংশ মাত্র। এদের একটা বড় অংশ পেশাগত ভাবে ছিল বয়নশিল্পী (weavers) এবং কারখানাতেও তারা প্রধানত উইভিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করত।

পঞ্চমত, শ্রমিকদের জাত-বর্ণগত (Caste composition) অবস্থানের যে পরিচয় ১৯১১ ও ১৯২১ সালের জনগণনা থেকে পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, চামার, মুচিসহ সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি থেকে ৩০ শতাংশের বেশি শ্রমিক এসেছিল, যেখানে দক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে ছিল মাত্র ৯ শতাংশ। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের শেখ জোলার মতো উচ্চ সম্প্রদায় থেকে দক্ষ শ্রমিকের প্রায় ৪১ শতাংশ এবং অদক্ষ শ্রমিকের মাত্র ৬ শতাংশ ছিল।

চটকল শ্রমিকদের মধ্যে অভিবাসীদের এই বিরাট সংখ্যাধিক্যের ফলে এই শ্রমিকরা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এবং স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী (isolated social group) হিসাবে থেকে যায়, যাদের সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কোনো সামাজিক একত্ববোধ ছিল না।

সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণভেদ প্রথা

শ্রমিকদের সামাজিক জীবনের কোনো আলোচনাই সাম্প্রদায়িকতা বোধ ও বর্ণপ্রথার প্রচলনের কথা ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। দেশভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা এক সাম্প্রদায়িক হিংসার জন্ম দিয়েছিল যার প্রভাব থেকে চটকলগুলিও মুক্ত থাকতে পারেনি। ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গা ও তার প্রতিক্রিয়ায় সীমান্তের এপারে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও ভীতিপ্রদর্শনের কিছু ঘটনায় বিভিন্ন চটকলের এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম তাঁতি পূর্ববাংলায় চলে যাওয়ায় চটকলগুলিতে শ্রমিকের বিশেষত তাঁতিদের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইজমার ১৯৫০-৫১ সালের রিপোর্টে বলা হয় যে, মুসলিম তাঁতিদের এই পলায়নের ফলে হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত হাওড়া থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত এবং নদীর অপর তীরে বিশেষত বরাহনগর (আলমবাজার), জগদ্দল, কাঁকিনাড়া ও নৈহাটির চটকলগুলিতে উৎপাদন দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। পরে অবশ্য ১৯৫০ সালের ভারত-পাক চুক্তি অনুসারে মুসলিম শরণার্থীদের একটা বড় অংশ আবার পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসে এবং চটকলগুলিতেও স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়[11] (এই চুক্তি তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলির নামে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি নামে প্রচলিত)। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে অবিভক্ত বাংলার

রাজনীতিতে মুসলিম লিগের প্রাধান্য থাকার ফলে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির যে লাগাতার প্রয়াস ছিল, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা অনেকটাই প্রশমিত হয়। তা সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দমূলক অবস্থানের পাশাপাশি গোষ্ঠীগত রেষারেষির একটা পরোক্ষ পরিবেশ টিকে ছিল এবং মাঝে মাঝে তার বহিঃপ্রকাশও ঘটত।[12]

অনুরূপভাবে স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম পর্বেও প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের মতই হিন্দু শ্রমিকদের মধ্যেও বর্ণভিত্তিক বিভাজন লক্ষ করা যায়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে চটকল মালিকরা চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে জাতপাতের এবং ছোঁয়া-ছুতের বিচার থাকায় কুলি লাইনগুলিকে যতদূর সম্ভব সেই ভাবে ভাগ করে শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করত। শ্রমিকরা গ্রামের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে জাতপাতের রক্ষণশীল মনোভাব সঙ্গে নিয়ে শহরে এসেছিল যার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা খুব সহজ ছিল না। ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন গবেষণা থেকে ধর্মভিত্তিক কুলি লাইনের পাশাপাশি বর্ণভিত্তিক কুলিলাইনের কথাও জানা যায়।[13] এমনকি একাধিক সরকারি প্রতিবেদনেও কুলি লাইনগুলিতে বিভিন্ন জাতের শ্রমিকদের পৃথক পৃথক ভাবে বসবাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো চটকলে জাতপাতের বিচার অতি কঠোর ছিল।

তবে কোম্পানি নির্মিত কুলি লাইনের সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায়, ক্রমশই শ্রমিকরা প্রধানত চটকলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্দারদের ভাড়া দেওয়া বস্তির কুঁড়ে ঘরে বা বেসরকারি জমির মালিকদের নির্মিত বস্তিতে বাস করতে শুরু করে। এইসব জায়গায় নিম্নজাতের লোকের পাশাপাশি উচ্চবর্ণের লোকেরা এমনকি ব্রাহ্মণরাও বাস করত। এর ফলে জাতিপ্রথার কঠোরতা ধীরে ধীরে হলেও কমতে থাকে এবং বিভিন্ন জাতির লোকেদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও সংযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।[14] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এমনকি স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দুই দশক চটকল শ্রমিকদের ব্যাপক আকারে সপরিবারে এই শিল্পাঞ্চলে বসবাস শুরু না করায়, শ্রমজীবীদের মধ্যে জাতপাতের যে বিচার তা অনেকটাই অকার্যকর থেকে গিয়েছিল, কারণ ধর্মীয় আচার, রীতিনীতি পালন তথা পারিবারিক মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে বাড়ির নারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

জাতপাত ও বর্ণভেদ

শ্রমিকদের সামাজিক জীবনের একটি বড় দিক ছিল বর্ণভিত্তিক দূরত্ব, জাতপাত এবং অস্পৃশ্যতা। গোড়া থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। জুট

মিলের কোয়ার্টার্সগুলিও আমরা আগেই দেখেছি যে জাত ধর্ম অনুসারে পৃথক করে সংগঠিত করা হত। গ্রামের বর্ণভিত্তিক এক বৃহৎ যৌথ সংযুক্ত পরিবারে থাকার ঐতিহ্যই এরা এখানে নিয়ে আসে। তবে এক্ষেত্রে গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহনের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও ক্রিয়াশীল ছিল, যেমন বাংলার অচেনা অজানা নতুন পরিবেশে নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে ওঠার জন্য নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ভাবে একত্র থাকাই তারা শ্রেয় মনে করেছিল। অর্থাৎ এখানে তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহেতু কৌমচেতনা (community consciousness) বেশি কাজ করেছিল। আদি দেশগ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যতই শিথিল হতে থাকে, বাংলার চটকল শ্রমিকদের মধ্যে জাতপাতের প্রশ্ন ততই ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে। যদিও জাতপাতের প্রশ্ন তাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় হলেও থেকে গিয়েছিল। উত্তর ভারতের গ্রামীণ সমাজের সংকীর্ণতার সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের খোলামেলা পরিবেশের তফাত ছিল লক্ষ করার মতো। এমনকি ১৯৮০-র দশকেও চটকল শ্রমিকরা বাংলা থেকে বিহারে দেশগ্রামে যাওয়ার পথে ট্রেনে ওঠার আগে পায়ের জুতো খুলে বাক্সে রাখত, কেননা গ্রামে জুতো পরলে উঁচু জাতের মাতব্বররা তাদের গায়ের চামড়া তুলে নেবে।[15]

কালক্রমে 'জাত থেকে 'দেশ' (গ্রাম বা অঞ্চল) বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। গৌতম ঘোষ পরিচালিত এবং নাসিরুদ্দিন শাহ ও শাবানা আজমি অভিনীত *পার* সিনেমায় দেখা যায়, ১৯৮৩ সালে বিহারে উচ্চবর্ণের জমিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে প্রতিশোধমূলক খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে নিম্ন বর্ণের (মুসাহার সম্প্রদায়ভুক্ত) এক দম্পতি। নৈহাটির চটকলের কুলি লাইনে আশ্রয় নিতে গিয়ে তার পরিচিত মানুষটিকে দেখতে না পেয়ে সে অন্য শ্রমিকদের কাছে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে জানতে পারে যে, সেই মিলের সর্দারও তার দেশের লোক। তখন সে দেশওয়ালি ভাইচারার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তার কাছে চাকরির দরবার করে। কিন্তু সর্দারদের আগের মতো আর কাজে ঢোকানোর ক্ষমতা না থাকায় চাকরি দিতে না পারলেও সাময়িক আশ্রয় দেয়।

বাংলার অভিবাসী চটকল শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম দিক হল তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান। প্রথমত বলা যায় যে, এই চটকল শ্রমিকরা বিভিন্ন ধর্ম, জাতিবর্ণ, ভাষা ও প্রদেশের পটভূমি থেকে আসা এক বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী। তাদের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আলোচনা করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। আবার সংস্কৃতিগতভাবে তাদের একটি গোত্রে ফেলা যায় না। তাদের মধ্যেকার অজস্র স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ভাষার ও ধর্মের মানুষ একই ছাদের তলায় পাশাপাশি কাজ করলেও তাদের নিজ নিজ ভাষা,

সংস্কৃতি, আচার, অনুষ্ঠান ও ধর্মের প্রতি ছিল গভীর বিশ্বাস। সম্ভবত গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন এই শ্রমিকদের বেঁচে থাকার বড় অবলম্বন ছিল তাদের ধর্ম ও ভাষা। তাই তাদের জীবনের অধিকাংশ আচার অনুষ্ঠানই ধর্মকে ঘিরেই আবর্তিত হত।

সারা সপ্তাহে হাড়ভাঙা খাটুনি, কারখানার ভেতরের ও বাইরের দুর্বিষহ জীবন, এমনকি রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও শ্রমিকদের কাছ থেকে জোর করে কাজ আদায় করে নেবার চেষ্টা, ইত্যাদি শ্রমিকদের কর্মক্লান্ত ও বিষাদগ্রস্ত করে তুলত। এই জীবন থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার জন্য মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও আমোদপ্রমোদের প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে একান্তভাবে অনুভূত হত। উৎসব পার্বণের ছুটি তাদের এই আনন্দ উপভোগের সুযোগ এনে দিত। তাই বিভিন্ন উৎসবের সময় চটকল শ্রমিকরা মিল ম্যানেজারের কাছে ছুটির আবেদন করে তা সাধারণত আদায় করে নিত। আবার ছুটি না দিলে তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়ত। কিছু বাঙালি স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে দুর্গাপূজা, দোল ও রথযাত্রা ছিল প্রধান উৎসব। দুর্গাপূজার সময় তারা বিভিন্ন ব্যক্তি, বিশেষত দোকানদার ও অন্যান্য শ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করত। পূজার সময় চটকল পার্শ্ববর্তী ফাঁকা জায়গায় যেখানে পূজা হত, সেখানে তার সঙ্গে মেলা বসত এবং গানবাজনারও আয়োজন করা হত। ঠিক একই ভাবে ঈদ ও মহরমের সময় বাঙালি ও অবাঙালি নির্বিশেষে মুসলমান শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে চটকলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জড়ো হত। তারা নিজেরাও চাঁদা দিত এবং স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকেও চাঁদা সংগ্রহ করত। বাদ্য সহকারে মিছিল বেরোলে তারা দলবদ্ধভাবে তাতে যোগ দিত। আর অভিবাসী হিন্দিভাষী হিন্দু শ্রমিকরা ছুটি পেলে তাদের প্রধান উৎসব হোলি এবং ছটপূজার সময়ে (এবং ওড়িয়া শ্রমিকরা রথযাত্রার সময়ে) বিহার ও উত্তরপ্রদেশে স্ব স্ব গ্রামে নিজেদের পরিজনদের সঙ্গে উৎসব উদ্‌যাপন জন্য চলে যেতেন।[16]

এই ধরনের বার্ষিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ছাড়াও তাদের ধর্মবিশ্বাসের দৈনন্দিন বহিঃপ্রকাশ ঘটত শ্রমিক বস্তি অঞ্চলে একাধিক মন্দির মসজিদ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। অভিবাসী শ্রমজীবীদের আগমনের প্রথম পর্বে এমনকি স্বাধীনতার পরেও যখন চটকল শ্রমিকরা বহুসংখ্যায় স্থায়ীভাবে সপরিবারে মিল অঞ্চলে বসবাস শুরু করেনি, তখন এই অঞ্চলে তাদের আরাধ্য দেবদেবীরও থাকার পাকা বন্দোবস্ত ছিল না। রাস্তার ধার বরাবর অশ্বত্থ গাছ, বটগাছ বা নিম গাছের তলায় একটি শিবলিঙ্গ বা পাথর রেখে সেই গাছকেই পূজা করার রীতি ছিল। সমগ্র চটকলগুলির কুলি লাইন জুড়ে আজও এই ধরনের মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। কালক্রমে স্বাধীনতার পর প্রথম দু'দশকে চটকল শ্রমিকরা কুলি লাইন থেকে বেরিয়ে ধীরে

ধীরে সপরিবারে মিল-পার্শ্ববর্তী বস্তি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। বস্তি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চল জুড়ে রাস্তা বরাবর শিব, শনি ও শীতলা ঠাকুরের পাশাপাশি রাধাকৃষ্ণ ও কালী মন্দিরও গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তখনও সেই পর্যায়ে এই মন্দিরগুলি পাকাপোক্ত ভাবে গড়ে ওঠেনি।[17]

স্বাধীনতার পর শ্রমিকরা সপরিবারে স্থায়ীভাবে মিলাঞ্চলে বসবাস শুরু করলে, তাদের আরাধ্য দেবতারাও ক্রমশ বাংলায় স্থায়ী জায়গা পেতে থাকেন। পূর্বে উল্লিখিত গাছের তলা থেকে উঠে গাছের গোড়ায় ইট দিয়ে বেঁধে ঠাকুরের আসন তৈরি করা হয়। নিয়মিত পূজার্চনা শুরু হয়। বস্তির মানুষরা সম্মিলিতভাবে নির্দিষ্ট দিনে উৎসব, জাগরণ প্রভৃতির উৎসবের আয়োজন করতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরে দৈনন্দিন পূজার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত স্বনিয়োজিত ভাবে কাজ শুরু করেন। ফলে মন্দিরের প্রভাব প্রতিপত্তিও বাড়তে থাকে।

নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে যেমন সংযোগ ও সংহতি গড়ে উঠত, তেমন পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ চেতনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাবও লক্ষ করা যায়। এবং অনেক ক্ষেত্রে মন্দির মসজিদকে কেন্দ্র করেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হত। তাছাড়া ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেও সামাজিক সংযোগের পরিবেশ সৃষ্টি হত। স্থায়ীভাবে মিল অঞ্চলে বসবাসের আগে এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান পালনের জন্যও শ্রমিকরা ছুটি নিয়ে গ্রামদেশে চলে যেত।

চটকল শ্রমিকরা তাদের স্ত্রী পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাস করার ফলে তাদের পারিবারিক পূজাপার্বণে জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় সামাজিক মর্যাদা অর্জন বা বৃদ্ধির এক বিশেষ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাঁকজমক পূর্ণ আচার অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বণ। অর্থাৎ সনাতনী হিন্দু গ্রামীণ ভারতীয় ঐতিহ্য শুধু অব্যাহতই রইল না, তা আরও ব্যাপ্ত ও বিকশিত হল। লক্ষণীয় যে, এই সময়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বামপন্থীদের উত্তরোত্তর প্রবল উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের বস্তুবাদী নিরীশ্বরবাদী দর্শন শ্রমিকদের জীবনে কোনো দাগই কাটতে পারেনি। আবার চটকল শ্রমজীবীদের মধ্যে একটা বড় অংশই ছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত, শোষিত দলিত নিম্নবর্ণের মানুষ, এই শিল্পাঞ্চলে তারা নিজেদের পৃথক সাংস্কৃতিক অবস্থান তৈরিতে সচেষ্ট হয়। শ্রমজীবীরা ব্রাহ্মণ্যরহিত একাধিক উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদকে পরোক্ষভাবে তাদের জীবনে নাকচ করে দেয়। এমনই কিছু উৎসবের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করব।

মকর সংক্রান্তি, হোলি বা দোলযাত্রা, দেওয়ালি বা দীপাবলির মতো উৎসবে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিক নিজের নিজের বৃত্তের মধ্যেই প্রধানত সমান উৎসাহ নিয়ে অংশ নিত। কিন্তু অবাঙালি শ্রমিকদের একান্ত নিজস্ব দুটি অনুষ্ঠানের কথা আলাদা করে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হল জিতিয়া, অন্যটি হল ছটপূজা, যেগুলি তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিবর্তনের ছবি তুলে ধরে। তাছাড়া শ্রমজীবীদের মধ্যে সন্তোষী মাতা, শীতলা মাতার আরাধনা সমানভাবে জনপ্রিয় ছিল। লক্ষণীয় যে, এই সমস্ত উৎসব বা পুজোই ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিতবিহীন সর্বশ্রেণির অনুষ্ঠান এবং তাতে গৃহস্থ মহিলাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল।

জিতিয়া অনুষ্ঠান

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় 'জিউতিয়া বা জীবিত পুত্রিকা ব্রত' অনুষ্ঠানের কথা। বাংলায় হিন্দিভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে উৎসবটি জিউতিয়া নামে পরিচিত হলেও ভোজপুরী অঞ্চলে এই অনুষ্ঠান জীবিত পুত্রিকা ব্রত নামেও পরিচিত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বলতে হয় এই উৎসবের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই চটকল শ্রমজীবীদের বাড়ির মহিলারা। প্রধানত বিবাহিত মহিলারাই এই উৎসব পালন করতেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্রমে জানা যায়, প্রায় সমস্ত অবাঙালি হিন্দিভাষীদের বাড়িতেই এই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের দিন ভোর সকালে এই হিন্দিভাষী মহিলারা 'সরগি' অর্থাৎ কিছু অন্ন মুখে নিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ করে। অনুষ্ঠানের দিন ও রাত মহিলারা বিনা অন্নজলে ভগবানের কাছে প্রার্থনায় নিজ স্বামী ও সন্তানদের জন্য দীর্ঘ আয়ু কামনা করে থাকেন। বস্তুত এই অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁরা নিজ পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও নিজ পরিবারের পুত্রসন্তানদের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। অনুষ্ঠানের পর দিন বাড়িতে ভাল-মন্দ রান্নাবান্না করা হয় এবং নিজ আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রিত করে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হয়। ফলে ১৯৭০ এর দশক থেকে বৃহৎ পরিবারে যে বিভাজন দেখা যায় সেই পরিবারগুলিকে এই অনুষ্ঠানের দ্বারা একে অপরের কাছে আসতে সাহায্য করে।[18]

ছটপূজা

ছটপূজা বিহার ও উত্তরপ্রদেশের অন্যতম প্রধান পূজা। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দুই দশক যখন এই শ্রমিকেরা সপরিবারে বাংলায় থাকত না, তখন এই ছটপুজোকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে যেত পরিবারের সঙ্গে এই উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য। ১৯৭০-এর দশক থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে, অনেক

শ্রমিকই তাদের পরিবারকে নিয়ে আসে বাংলায়, ফলে তাদের গ্রামীণ জীবনের অন্যতম উৎসব ছটপূজা বাংলায় অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। এই সময়পর্বে এই উৎসব ততটা জনপ্রিয় না হলেও, কালক্রমে এই উৎসব বাঙালি ও অবাঙালি উভয়ের মধ্যে অতি পরিচিত ও প্রিয় এক উৎসবের রূপ নিতে থাকে। চার দিন ধরে উদ্‌যাপিত এই উৎসব কোনো অর্থেই বাংলার দুর্গোৎসবের চেয়ে কম নয়।[19]

চারদিন ধরে এই উৎসব পালন করা হয়। প্রথম দিন 'লাউ ভাত' নামে পরিচিত। এই দিন বাড়ির প্রত্যেক খাবারে অল্প বিস্তর লাউ-এর ব্যবহার করা হয় এবং লাউ ভাত খাওয়ার মধ্য দিয়ে উৎসব আরম্ভ হয়। প্রথম দিন 'খরনা' নামে পরিচিত। এ দিন রাত ৭টা থেকে ৮টার মধ্যবর্তী সময় 'ছট মাতার' আরাধনা করা হয় এবং প্রসাদ হিসাবে মিষ্টি ভাত, রুটি ও কলা বিতরণ করা হয়। উক্ত সময়পর্বে সমস্ত অঞ্চলে এক অদ্ভুত নীরবতা পালন করা হয়। পরের দিনকে বলা হয় 'পয়লা অর্ঘ্য' অর্থাৎ প্রথম অর্ঘ্য। এদিন তারা বিকেলে সূর্যাস্তের আগে মাথায় প্রসাদের থালা ও কাঁধে কলার কাঁধি নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গঙ্গায় যায় এবং সূর্য প্রণাম করে থাকে। চতুর্থ দিন 'দুসলা অর্ঘ্য' অর্থাৎ দ্বিতীয় অর্ঘ্য নামে পরিচিত। এদিন ভোর সকালে সূর্যোদয়ের আগে একই ভাবে মাথায় প্রসাদের থালা ও কাঁধে কলার কাঁধি নিয়ে খালি পায়ে গঙ্গায় গিয়ে সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে সূর্যকে প্রণাম জানানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই উৎসবেও মহিলারাই থাকে প্রাণকেন্দ্রে।[20] অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চটকল শ্রমজীবীদের এই পূজা করতে দেখা যায়।

হোলি

শুধু বাংলা নয়, সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে এই উৎসব পালিত হয়। স্থানবিশেষে এই উৎসবের গল্পকথাও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, বাংলা ও ওড়িশা জুড়ে এই উৎসব মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মোৎসব হিসাবে পালন করা হয়, আবার কোথাও অসুর হিরণ্যকশিপুর ওপর ভগবান নারায়ণ ও ভক্ত প্রহ্লাদের বিজয়ের স্মরণে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে, রাধা-কৃষ্ণের রঙের খেলাকেও এই উৎসবের উৎস হিসেবে ধরা হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কামা-রতির গল্পকথা। ভোজপুরী ভাষায় এটি ফগুয়া নামেও পরিচিত।[21] তবে বাংলায় বসবাসকারী শ্রমজীবীদের কাছে এটি হোলি নামেই সমধিক পরিচিত। বর্তমানে খুব উৎসাহের সঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে এই উৎসব পালিত হলেও, একদা এটি ছিল দলিতের উৎসব। ব্রাহ্মণরহিত এই উৎসব হিন্দু ধর্মের মূলস্রোতে নিচু জাতির উৎসব রূপেই পরিচিত ছিল। ভোজপুরী লোকউক্তিতে বলা

হয়ে থাকে:

ব্রাহ্মণ কে রচ্ছা বন্ধন, ছতরী কে দসহরা।
বৈস কে দেওয়ালী, আ নীচ্চন কে হোলি।[22]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য রাখিপূর্ণিমা, ক্ষত্রিয়দের জন্য বিজয়াদশমী, বৈশ্যদের জন্য দীপাবলি ও ছোট জাতের জন্য হোলি উৎসব। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্তমানে ভাইদের হাতে বোন বা দিদিরা রাখি বাঁধলেও, একদা এই কাজ সমাজের উচ্চ শ্রেণিভুক্ত ব্রাহ্মণরাই করত। বিজয়া দশমীর দিন রাম রাবণকে হত্যা করে যুদ্ধ জয় করেন বলে সেই দিনটি ক্ষত্রিয়দের কাছে বিশেষ সম্মানের দিন। অন্য দিকে দীপাবলিতে মূলত লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়, তাই বৈশ্য, যারা মূলত ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকে, এই উৎসবটি তাদের কাছে বিশেষ একটি দিন। তবে হোলি উৎসবটি হল দলিতদের। এই উৎসবকে দলিতদের উৎসব বলার অনেক কারণ আছে। প্রথমত, 'ছট পুজোর' মতোই এই উৎসবেও ব্রাহ্মণদের কোনো স্থান নেই। বিহার উত্তরপ্রদেশ তথা বাংলার বিস্তীর্ণ চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে দোলযাত্রার পরের দিন হোলি উৎসব পালন করা হয়। দ্বিতীয়ত কথিত আছে, শৈশবে পুতনার বিষাক্ত দুগ্ধপান করে কৃষ্ণের গায়ের রং কালো হয়ে যায়, যৌবনে কৃষ্ণ যখন রাধার প্রেমে পড়েন, তিনি তাঁর গায়ের রঙের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর ভয় হয়, রাধার মতো সুন্দরী মেয়ে তাঁর কালো রঙের জন্য তাঁকে নাকচ না করে দেয়। তাঁর হতাশা দেখে তাঁর মা তাঁকে রাধার কাছে যেতে বলেছিলেন ও রাধার মুখে রাধার পছন্দমতো যে কোনো রং মাখিয়ে দিতে বলেছিলেন। কৃষ্ণ তাই করেন, এবং তারপরই তাঁদের প্রেমপর্ব শুরু হয়। এই উপাখ্যানে দুটি দিক খুব স্পষ্ট: প্রথমত, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, যার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত, বর্ণভেদ যা এই উৎসবের ইতিহাসে বিধৃত। গায়ে কালো রং সমাজের এক বিশেষ শ্রেণিকে দর্শায়, সে-কারণেই কোনো দলিত বা আদিবাসীর গাত্রবর্ণ ফর্সা হলেই তাকে অহরহ শুনতে হয় 'দেখে তোমাকে আদিবাসী মনে হয় না'। কৃষ্ণবর্ণের মানুষ তথা অনার্যদের মধ্যে তাই এই উৎসব বিশেষ জনপ্রিয়। তাঁরা তাঁদের গাত্রবর্ণের জন্য সমাজে অচ্ছুত ছিলেন। হোলি উৎসবের মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের সমানাধিকারের দাবিই তুলে ধরেন। তৃতীয়ত, রঙের এই উৎসবে প্রথাগত কোনো পুজো হয় না। পূর্বপুরুষদের স্মরণ করলেও, প্রথাগত কোনো রীতিনীতি আচার-আচরণ মানা হয় না। এটি এই উৎসবের অনার্য চরিত্র পরিস্ফুট করে। চতুর্থত, হোলি উৎসব চটকল অধ্যুষিত হিন্দিভাষীদের কাছে আমোদপ্রমোদের উৎসব, এই দিন প্রত্যেকের বাড়িতে লুচি, পোয়া-পিঠে, ক্ষীরের পাশাপাশি আমিষ খাবার তৈরি হয়, আমিষের প্রাধান্য থাকে।

অন্যদিকে এই উৎসবের দিন চটকল শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় সকলে ভাঙ, দেশি-বিদেশি মদ ও অন্যান্য ধরনের মাদক দ্রব্য খেয়ে থাকে। প্রচলিত বর্ণাশ্রমের শুদ্ধ-অশুদ্ধের যে ধারণা তাতে স্বাভাবিক ভাবেই এই উৎসব হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে স্থান পায় না। পঞ্চমত, বাংলার চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে হোলি উৎসবে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরাও বৃহৎ সংখ্যায় যোগদান করে। মুসলিমরা মিলে কাজ করতে আসা হিন্দু শ্রমিকদের বাড়িতে আসে, উৎসবে যোগ দেয়। হোলি একটি প্রাচীন হিন্দু উৎসব রূপে পরিচিত হলেও, মধ্যযুগে মুসলিমদের ভারতে আগমনের পর সুলতানি তথা মুঘল আমলেও সুলতান বা মুঘল সম্রাটদের খুব সহজে হোলি উৎসব উদ্‌যাপন করার একাধিক প্রমাণ আমরা পাই। মুসলিমদের এই উৎসবে যোগদানে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কোনো প্রতিবাদের কথা আমরা জানতে পারি না, সম্ভবত দলিতদের এই উৎসব নিয়ে উচ্চবর্ণের মানুষদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না, তাই কোনো প্রতিবাদও দেখা যাইনি। যদিও অধুনা এই উৎসব এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে। একদা বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে উৎসবের জন্ম তা আজ প্রেমের উৎসবের রূপ নিয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকলের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

মকর সংক্রান্তি

চটকলের হিন্দিভাষী হিন্দুদের অন্যান্য উৎসবগুলির মধ্যে আর একটি অন্যতম উৎসব হল মকরসংক্রান্তি, যেটি দহি-চুড়া বা খিচড়ি নামেও বহুল প্রচলিত। বাংলায় পৌষ সংক্রান্তি উৎসব আসলে একটি ফসলি উৎসব।[23] স্বাভাবিক কারণেই চটকলের হিন্দিভাষী শ্রমজীবীদের জীবনে এই উৎসবের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত, এই শ্রমজীবীদের আদি জীবিকা ছিল কৃষি, গ্রামের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ প্রায় ক্ষীণ হলেও, এই উৎসবগুলির মধ্য দিয়ে তারা তাদের শিকড়কে খুঁজে পায়। মূলত জানুয়ারি মাসের ১৪ বা ১৫ তারিখে অর্থাৎ পৌষ মাসের সংক্রান্তি বা শেষ দিন এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। এই উৎসবও পুরোহিতবর্জিত উৎসব। এই উৎসবে পূর্বপুরুষদের আত্মার তৃপ্তি কামনা করা হয়। বাংলার হিন্দিভাষী শ্রমজীবীদের মধ্যেও এদিন গঙ্গানদী জুড়ে ঢল নামতে দেখা যায়। সকাল সকাল স্নানাদি সম্পন্ন করে দই-চিঁড়ে, গুড়, ভিন্ন প্রকারের তিলকুট, ইত্যাদি খাওয়া হয়। খাওয়ার পূর্বে এই খাবারগুলো পূর্বপুরুষদের অর্পণ করা হয়। বিকেল থেকে শুরু হয় সম্মিলিতভাবে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন। রাতে খিচুড়ি খাওয়ার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলায় পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে পুলি, পায়েস, প্রভৃতি

খাওয়ার চল থাকলেও বাংলার চটকল হিন্দিভাষী শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রধানত বিহার, উত্তরপ্রদেশে নতুন ফসল হিসেবে উৎপাদিত সামগ্রী থেকে তৈরি দই, চিঁড়ে, তিলের তৈরি তিলকুট, গুড়, প্রভৃতির প্রাধান্য (যেগুলি) বাংলায় তাদের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা আমাদের কাছে তুলে ধরে। পাশাপাশি, তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি আঁকড়ে থাকার প্রবণতাও ফুটে ওঠে এই উৎসবের মধ্য দিয়ে।

দীপাবলি বা দিওয়ালি

চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে অন্যতম উৎসব হল দীপাবলি বা দিওয়ালি। আলোর উৎসব রূপে পরিচিত দিওয়ালি বাঙালির কালীপূজার পর দিন উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় এক মাস ধরে এই পুজোর প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রায় প্রত্যেকের বাড়ি পরিষ্কার ও রং করা হয়। বাড়ি ও উঠোন জুড়ে বিভিন্ন ধরনের রঙ্গোলি তৈরি করা হয়, বাড়িকে সাজানো হয় আলো দিয়ে। বাজার জুড়ে দেখা যায় বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা। বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা হত মাটির ঘরোনা।[24] উৎসবের দিন প্রায় প্রত্যেক হিন্দিভাষী হিন্দুদের বাড়িতে গণেশ লক্ষ্মীর পুজো হয়। খই, লাড্ডু, ভিন্ন আকৃতির বাতাসা মিঠাই, বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে পুজো করা হয়। লক্ষণীয় বিষয়, এই পুজোতেও ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন হয় না, বাড়ির মেয়েরাই এই পুজো সম্পাদন করে।

সন্তোষী মাতা

ভোজপুর থেকে আগত বাংলার এই শ্রমজীবীদের পারিবারিক জীবনে সন্তোষী মাতার উপস্থিতিও বেশ নজরে পড়ে। কথিত আছে সন্তোষী মাতা মনস্কামনা পূরণের দেবী। ইনি ভোজপুর অঞ্চলে এতই জনপ্রিয় যে, তাঁর মহিমাকে কেন্দ্র করে সন্তোষী মাতা-নামক এক প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়।[25] মূলত যে মানত করে সে ষোলোটি শুক্রবার বিশেষ নিয়মে সন্তোষী পূজা সম্পন্ন করে, শেষ শুক্রবার নয়জন শিশুকন্যাকে পুজো করে, পেট ভরে খাইয়েদাইয়ে পূজার সমাপ্তি করে। মূলত শ্রমজীবীদের বাড়ির মহিলারাই সন্তানপ্রাপ্তি, বিবাহ তথা অন্যান্য মনস্কামনা পূরণের জন্য সন্তোষী মাতার ব্রত করত।

শীতলা মাতা

শিল্পাঞ্চল জুড়ে পূজিত দেবদেবীর মধ্যে শীতলা মাতার বেশ জনপ্রিয়তাও লক্ষ করা যায়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত এই শ্রমজীবীরা তাদের সঙ্গে কিছু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলায় নিয়ে আসে।[26] শীতলা দেবী মূলত বসন্ত রোগের দেবী হিসাবেই

প্রচলিত। যখন কোনো ব্যক্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় তখন ধারণা করা হয় যে, তার উপর শীতলা মায়ের প্রকোপ পড়েছে। অতপর শীতলা দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য তাঁর পূজা করা হয়, এবং তিন দিন পুজোর পর শীতলা মাতার প্রকোপ কমে যায় বলে জন বিশ্বাস আছে।

এর বাইরেও ভোজপুর অঞ্চলে প্রচলিত একাধিক দেবদেবীর কথা জানা যায় যেমন পিলেগ (প্লেগের দেবী) মইয়া, চটপটি মাতা, খোঁখি মইয়া, সোমে মাই। কিন্তু এই সব দেবদেবী বাংলার চটকল শ্রমজীবীদের জীবন থেকে প্রায় বিস্মৃত হয়ে পড়েছে। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে যে, শ্রমজীবীদের জীবনে প্রচলিত ধর্মীয় ভাবনাও তাদের নিত্যপ্রয়োজনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।[27]

সামাজিক উৎসব

শ্রমজীবীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যরহিত পূজাপার্বণের ব্যাপক চল থাকলেও, সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণদের একেবারে অগ্রাহ্য করা যায়নি। তাই প্রাত্যহিক সামাজিক রীতিনীতি তথা কাজকর্মে কমবেশি ব্রাহ্মণদের উপস্থিতি বেশ লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে ১৯৯০-এর দশক থেকে এই প্রবণতা সমান তালে বাড়তে থাকে।

পূজাপার্বণ ছাড়া তাদের আনন্দ উদ্‌যাপনের অঙ্গ ছিল বিবাহ, সন্তানের জন্ম ও অন্নপ্রাশন। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক ক্রিয়াও সাধ্যমতো বা কখনও সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে করা হত। আগে এই সব কারণেই শ্রমিকরা গ্রামে গিয়ে রীতি-রেওয়াজ পালন করত, কিন্তু পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ক্রমশই শহরে তা উদ্‌যাপিত হতে থাকে এবং এই রীতি-রেওয়াজ পালনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[28]

সামগ্রিকভাবে বলা যায় বিহার, উত্তরপ্রদেশের কঠোর বর্ণব্যবস্থা থেকে সাময়িকভাবে তারা বাংলায় মুক্তি পেয়েছিল শুধু তাই নয়, এখানে তারা সচেতন বা অচেতন মনে একটা স্বাতন্ত্র্য ধর্মীয় অবস্থান গড়ে তুলতে থাকে। এই অবস্থানের সঙ্গে শুধু যে দলিতরা জড়িয়ে ছিল তাই নয়, ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় বিশ্বাসী উচ্চ বর্ণের মানুষরাও ক্রমশ দলিতদের দ্বারা সৃষ্ট এই ধর্মীয় রীতিনীতির অংশ হতে শুরু করে। তবে একথাও ঠিক তারা সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদকে নাকচ করে দেয়নি। পারিবারিক রীতি আচার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ্যদের বেশ প্রাধান্য বজায় ছিল, তবে তা গ্রামের মতো কঠোর ছিল না একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। বর্ণভেদ বা অস্পৃশ্যতাও বাংলায় ক্রমশ তার কঠোরতা হারিয়ে ফেলে, যদিও দেশগ্রামে ফিরে গেলে আবার তারা বর্ণভেদ বা অস্পৃশ্যতার শিকার হত।

পরিশেষে বলা যায়, কারখানা স্থাপনের এবং এই অভিবাসী শ্রমজীবীদের বাংলায় আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে জাত বিচারেই তাদের বাসস্থান নির্ধারিত হত। অর্থাৎ, সেই দেশগ্রাম থেকে বাংলায় আসার পথে এরা জাতব্যবস্থা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ক্রমশ এই জাতব্যবস্থা মিল অঞ্চলে তার উগ্র ভাব হারাতে থাকে। বিশেষত মদের আসরে এই জাতব্যবস্থা তেমন গুরুত্ব পেত না। চটকল শ্রমজীবীদের বৃহত্তর সামাজিক জীবনে জাতব্যবস্থা ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। যদিও বর্ণব্যবস্থা বা জাতপাত শ্রমিকদের মধ্যে একেবারে যে ছিল না একথা বলা ঠিক হবে না, বরং বলা যেতে পারে চটকল শ্রমজীবীদের মধ্যে জাতপাত বা বর্ণব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি শহুরে প্রভাব পড়েছিল। অর্থাৎ ব্যক্তি পরিসর তথা পারিবারিক ক্ষেত্রে যেমন বিবাহ, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতব্যবস্থা তার অস্তিত্ব বজায় রাখলেও, সামাজিক পরিসরে তা ভয়ঙ্করভাবে প্রকট রূপ নিত না। অন্যদিকে এই সময়পর্বে শ্রমজীবীদের মধ্যে জাতব্যবস্থা এতটা প্রকট না হলেও, ধর্মীয় ব্যবস্থা অটুট ছিল, এমনকি কেন্দ্রে চরম হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের আগমনের পর শ্রমজীবীদের মধ্যে তীব্র ধর্মীয় মেরুকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

এক কথায়, বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষত আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের শ্রমজীবী পরিচিতিটি যখন প্রধান হয়ে ওঠে, তখন মানুষে-মানুষে বিভাজনের ঐতিহ্যগত রূপগুলি মিলিয়ে যায়, কিন্তু, বিভাজনের উপাদানগুলো সমাজদেহে সুপ্ত থাকে। পরিস্থিতির পরিবর্তন সেই-সব বিভাজনের বীজগুলোকে জল-হাওয়া দেয়, এবং সেই পড়ে থাকা বীজ থেকে নতুন অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। ফলে, যে বিভিন্নতার সম্মিলন শ্রমজীবীদের একদিন প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র থেকে মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলার নিদর্শন হয়ে উঠেছিল, সেই বিভিন্নতাকে কাজে লাগিয়েই ব্রাহ্মণ্য শাসনতন্ত্র নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে শ্রমজীবীদের বাস্তব অবস্থাটি যখন তাঁদের স্বার্থের বিরূপ, তখন ঐক্যপ্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃতিকে স্মরণ ও নতুন রূপে গঠনের তাৎপর্য অসীম। সুস্থ, ন্যায্য, এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে নির্মিত সমাজের স্বপ্ন যাঁরা দেখতে চান, তাঁদের পক্ষে এই শ্রমজীবী সংস্কৃতিগত ঐক্য ও বিভাজনের রূপগুলো স্পষ্ট চিনে নিতেই হবে।

শত্রুঘ্ন কাহার, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, এবং অতিথি অধ্যাপক, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়। রাজনৈতিক কর্মী।

1 বি. ফলি, *রিপোর্ট অন লেবার ইন বেঙ্গল* (কলকাতা-১৯০৬)
2 শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেশ, সুলভ শরৎ সমগ্র, ভল্যুম ২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১৭২৮-৩২
3 মহাশ্বেতা দেবী, 'হারুণ সালেমের মাসি', *পাঠ সংকলন*, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক, কলকাতা, 2011
4 কানাই পদ রায়, *শিল্প মানচিত্রে উত্তর ২৪ পরগণা*, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা-১২, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৪১।
5 ভূপতিরঞ্জন দাস, *পারিবারিক কাহিনীতে চটকলের স্মৃতি*, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও রুশতী সেন সম্পাদিত, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৩৪৫
6 Ranajit Das Gupta, *Labour and Working Class in Eastern India*: Studies in Colonial History, K P Bagchi & Company, Calcutta, 1994, Pp- 57-58
7 P.S Gupta, 'Notes on the Origin and Structuring of the Industrial Labour Force in India, 1880-1920 in Indian Society': *Historical Probings*; ed. R.S. Sharma, People's Publishing House, New Delhi, 1977, p- 424
8 B. Foley, *Report on Labour in Bengal*, Cal, 1906, Para- 29.
9 "By the 1920s the labour force had become more or less settled in ethnic composition." *Report of the Royal Commission on Labour in India*, Delhi, 1931, Pp- 21-24
10 Deepika Basu, *The Working Class in Bengal: Formative Years, Preface*, Cal, 1993
11 *ইজমা বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯৫১, পৃষ্ঠা- ৬২
12 *IB Report*, serial no- 368, File No, 970-47, File Name, Krishna Sukul, Situation of communal riots in post-independence Titagarh. Shakespeare Sarani, West Bengal State Archive Dated- 27-10-1947
13 অমল দাস, 'বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন ১৮৭০ এর দশক থেকে ১৯২০র দশক'; নির্বাণ বসু (সম্পাদিত) *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১১২
14 *Report on Survey of Labour Condition in Jute Factory*, op cit, P-53-54
15 সাক্ষাৎকার— দেবাশিস দত্ত, ফেডারেশন অফ চটকল মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, স্থান, রিষড়া, তারিখ-২১/০৮/২০২১
16 *Report on Survey of Labour Condition in Jute Factories in India*, Op.cit., P- 44, এ-ছাড়া দ্রষ্টব্য, শত্রুঘ্ন কাহার, অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা সন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৫৭-৫৮

17 ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে এ ধরনের অসংখ্য মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।
18 আলোক মৈত্র, *হাবেলিশহরের লৌকিক ধর্মে সংস্কৃতি ও সমাজ*, এখন প্রকাশনী, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩৯-৪০
19 ডॉ. কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়, **भोजपुरी लोक-संस्कृति**, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रेस, प्रयाग, 1989, पृष्ठ-335
20 भुनेश्वर भास्कर, **भोजपुरी लोक-संस्कृति और परंपरा**, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं विस्तार मंत्रालय, भारत सरकार, 2016, दिल्ली, पृष्ठ- 62
21 भुनेश्वर भास्कर, **पूर्वोक्त**, पृष्ठ—89-94
22 डा. शशिशेखर तिवारी, भोजपूरी लोकोक्तियां, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 2012, पृष्ठ 164
23 লোকনাথ চক্রবর্তী, মকর সংক্রান্তি, *সাপ্তাহিক বর্তমান*, ১৬জানুয়ারি, ২০২১, পৃষ্ঠা- ৮
24 भुनेश्वर भास्कर, **पूर्वोक्त**, पृष्ठ -66
25 Jai Santoshi Maa, Directed by Vijay Sharma and written R. Priyadarshi, 1975
26 भुनेश्वर भास्कर, **पूर्वोक्त**, पृष्ठ -53-56
27 डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय, **पूर्वोक्त**, पृष्ठ – 310-340
28 ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথোপকথন